সংগীতপরিচয়

ভারতবর্ষ গানের দেশ। আমাদের ছেলেরা গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে, বুড়োরা সুর করে করে পুরাণ পড়েন, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে জাঁতা পেষে ও ছাত পিটোয়। মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে গান করে; প্রতি পালপার্বণে গানের ছড়াছড়ি। রাজস্থানের ইতিহাস গানেতেই রক্ষিত ও প্রচারিত হত। প্রত্যেক ছন্দের বোধকরি আলাদা সুর আছে। এ দেশের মন্দিরে গান, মাঠে গান, গৃহে গান, বনে গান, উঠতে বসতে খেতে গান,—এমন কি ঘাট পর্যন্ত গান! এখানে গানের কাছ থেকে পালানোই শক্ত।

বাংলাদেশের নিজস্ব গান—বাউল কীর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই নে। তার রস বোধহয় সুরের চেয়ে কথার উপর বেশি নির্ভর করে। বাঙালী মনের যে অংশ পল্লীবাসী, তা যে এই সরস কথা ও সরল সুরের সংযোগে মেতে ওঠে এবং ভাবে ভোর হয়, তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি ও বুঝি। কিন্তু আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা সে সুরে ব্যক্ত হয় না, আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার সব কথায় সে সুর সাড়া দিতে পারে না। এখন যে আমরা হাটের মাঝে, পৃথিবীর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি,—মায়ের আঁচল ছেড়ে সংসারে প্রবেশ করেছি। ইতিমধ্যে বাইরের অনেক শহুরে রাজকীয় জিনিস আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। বাঙালী মেয়ের আটপৌরে কাপড় দেশী কালাপেড়ে লালপেড়ে শাড়ি হলেও, যেমন বেনারসী শাড়ি দূর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে তার পোশাকি বেশের স্থান অধিকার করেছে; তেমনি কীর্তনাদি খাঁটি বাংলা গান হলেও, রাগরাগিণীসংবলিত

ওস্তাদী বা দরবারী সংগীত বহুকাল থেকে আমাদের দেশে এমন প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে, আজ তার কুলশীলের খোঁজ না করেই তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করে নিতে হবে।

এই সংগীতের একটি সুবিধে এই যে, ভারতবর্ষের উত্তরভাগে তা প্রায় সমভাবেই প্রচলিত। সুতরাং আর্যাবর্তের সব জাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার পক্ষে সংস্কৃতঘেঁষা হিন্দী ভাষার জ্ঞান যেমন প্রধান সহায়, তেমনি তার সকল প্রদেশের সংগীত-রস আদানপ্রদানের পক্ষে ওস্তাদী সংগীতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা অতীব আবশ্যক। এ পরিচয় যে আরো ঘনিষ্ঠ এবং লোকসামান্য নয়, তার একটা কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমাদের সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। যা জানবার জন্য এত পরিশ্রম করতে হয়, সে শৌখিন বিদ্যা আয়ত্ত করতে আজকাল অনেকেই নারাজ,— এবং যা জানি নে তা ভাল লাগা অসম্ভব। আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রের মত সংগীতশাস্ত্রও অসংখ্য বিধিনিষেধে জটিল, এবং যাঁরা সে শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী, তাঁরা দশজনের শিক্ষার সৌকর্যার্থে তার সরল সংস্করণ প্রকাশ করবার কোনো চেষ্টা করেন নি, বরং যিনি যতটা জানেন স্ববংশের মধ্যে আবদ্ধ রাখতেই চেয়েছেন। দুঃখের বিষয় এ দেশের পেশাদার ওস্তাদের, সংগীত ছাড়া অপরাপর বিষয় শিক্ষাদীক্ষা এতই কম যে, কিসে সংগীতের উন্নতি হয় বা জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের ভাববার আবশ্যক বোধ হয় কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষে এও বলতে হয় যে, পুরাকালের রাজারাজড়া বড়লোক তাঁদের যে-ভাবে প্রতিপালন ও সমাদর করতেন, একালে সে সম্মান ও সাহায্যলাভে তাঁরা বঞ্চিত হওয়ায়, দারিদ্র্যবশতঃ অন্নচিন্তাতেই তাঁদের সমস্ত মন দিতে হয়। তারপরে সেকালে স্বরলিপি করবার পদ্ধতি না থাকায়, ওস্তাদদের স্মরণশক্তির উপর এতটা নির্ভর করতে হয় যে, তাঁরা সংগীতের শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে হিন্দু-বিধবার মত শুদ্ধাচারী ও শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। পাছে মুখস্থ বিদ্যার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে অমুক আইনের অমুক ধারা

অনুসারে দণ্ডনীয় হন, এই ভয়ে তাঁরা নিজেও অস্থির, এবং দেশসুদ্ধ লোককেও অস্থির করে তুলেছেন।

ওস্তাদী গানের প্রতি সাধারণ অভক্তির আর এক কারণ, ওস্তাদদের কায়দাকানুন। তাঁদের অনাবশ্যক মুখভঙ্গী, হাস্যকর অংগভঙ্গী এক কথায় মুদ্রাদোষ, এবং পরস্পরের কূটতর্কে,—যা প্রশস্ত সুন্দর রাজপথ হওয়া উচিত, তাকে এমনি কণ্টকিত জটিলারণ্যে পরিণত করেছেন যে, পথ-চলতি লোকের পাশ কাটিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিদ্যামাত্রেরই একটা মজুরি ও শিক্ষানবিশি আছে, তা অর্থকরীই হোক আর শৌখিনই হোক। কিন্তু শিক্ষার চরম ফলের মধ্যে তার প্রথম শুষ্ক ও কঠিন অংশের সমস্ত চিহ্ন লোপ পাওয়া উচিত,—যেমন চাষের ফলে নগ্ন রুক্ষ ভূমি স্বর্ণশস্যের মসৃণ রঙিন আস্তরণতলে অন্তর্হিত হয়। য়ুরোপীয়গণ এ কথা খুব বোঝেন এবং প্রথম থেকেই ছাত্রদের সংযত শোভন ভাব রক্ষা করবার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের সংগীতাচার্যগণ কেন যে এদিকে লক্ষ্য রাখেন না বলতে পারি নে। কানে হাত না দিয়েও চড়া সুর নেওয়া যে অসম্ভব নয়., কিংবা উচ্চারণ ও মুখের ভাব যত বিকৃত হবে, সংগীতও তত সংস্কৃত হতে যে বাধ্য নয়, তা তো হাতে হাতেই প্রমাণ করা যায়; বিশেষতঃ মেয়েদের তো সংগীতচর্চার সময় এ সব বিষয় খুব সাবধান থাকা দরকার। সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায় সেকালে রাজবাড়ির মেয়েদেরও গীতবাদ্য শেখাবার প্রথা ছিল, সুতরাং বোধহয় তখন সংগীতসরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীর এতটা বিচ্ছেদ ঘটে নি। একালে আশা করি আমাদের মেয়েরা আবার সেই শুভসম্মিলন সাধন করবেন।

ওস্তাদী গানের প্রতি আধুনিক ঔদাসীন্যের আর-একটি কারণ নিশ্চয়ই তার ভাষা। উচ্চাঙ্গের হিন্দুসংগীত প্রায়ই মূলহিন্দীর কোনো না কোনো অপভ্রংশে রচিত, এবং সে ভাষা অধিকাংশ বাঙালীর অপরিচিত বলে, সে গানও তেমন মর্মস্পর্শী বোধ হয় না। তার উপর অশিক্ষিত লোকের মুখে মুখে গানের অনেক কথা এমন বিকৃত হয়ে যায় যে, শিক্ষিত লোকের

পক্ষেও অর্থ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বাণী শুদ্ধ রাখবার দিকে ওস্তাদরা আর একটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়। অবশ্য সুর ও কথা মিলেমিশে গান হয়, এবং বাক্য ও অর্থের ন্যায় এস্থলে এ দুটিকে আলাদা করা অসম্ভব। কিন্তু পূর্বেই বলেছি হিন্দীভাষা আর্যাবর্তের মনের চাবিস্বরূপ। সেই সঙ্গে যখন সে-দেশের গানেরও এই একই চাবি, তখন কি সংগীতভক্ত বাঙালীর হিন্দী শেখার প্রতি একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়? তা ছাড়া সুর ও কথার মধ্যে সংগীতক্ষেত্রে সুরেরই প্রাধান্য মানতে হবে; কারণ কথা বাদ দিয়েও সংগীত হয়,—যথা যন্ত্রসংগীত কিংবা রাগালাপ, পাখীর ডাক কিংবা শিশুর কাকলি। কিন্তু সুর বাদ দিলে কথা সংগীতের এলাকা ছাড়িয়ে কবিতার রাজ্যে গিয়ে পড়ে। অবশ্য মিষ্টি কথারও একটা সাংগীতিক ধ্বনি আছে, যার মানে না বুঝলেও ভাল লাগতে পারে,—যেমন কোনো কোনো অজানা ভাষার আওয়াজও শ্রুতিমধুর বোধ হয়। সংস্কৃত শ্লোক বা মন্ত্রের মাহাত্ম্য তার সুগম্ভীর ধ্বনির উপর কতটা নির্ভর করে, তা সর্বলোকবিদিত। সে হিসেবেও বলতে পারি হিন্দী-ভাষার মূল্য কম নয়। জানি নে অভ্যাসবশতঃ কি-না, কিন্তু হিন্দী গান সম্পূর্ণ না বুঝলেও তা আমাদের কানে যত মিষ্টি লাগে, বাংলায় ভাঙলে সেই গানেরই আর তত লজ্জৎ থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবে।—

"অব ভজ ভোর প্রাত হরিনাম,
বন্দে সকল দুখ মিট যাত যাত
আওর সকল শরীর হোত কল্যাণ।"

জানি নে তোমাদের কি মনে হয়, কিন্তু "অব ভজ ভোর প্রাত হরিনাম" শুনলে আমার মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠে গঙ্গার ধারের—বিশেষতঃ কাশীর গঙ্গাতীরের ছবি; যেন নদীর তীরে বসে কোনো সৌম্যমূর্তি সাধু একতারা বাজিয়ে গান করছেন, এবং ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া এসে তাঁর ও আমাদের শরীরমন পবিত্র করে দিচ্ছে। আমাদের একজন কবি যে শরৎ-প্রভাতকে 'নিরাময়

নির্মল’ বিশেষণে ভূষিত করেছেন, সেই প্রভাত যেন এখানে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে, তাই "সকল শরীর হোত কল্যাণ"। এ কথাগুলি কোনো বাঙালীর বুঝতেও কষ্ট হয় না।

এবার এরই বাংলাটা শোন—

"সবে কর আজি তাঁর গুণগান
যাবে সকল দুঃখ, সব পাপ তাপ,
ওরে সকল সন্তাপ হইবে নির্বাণ।"

বাংলা গানটি ভাঙা বেশ ভালই হয়েছে, কিন্তু তবু যেন কি একটা রস উবে যায়, সেই বিশেষ ভাবটি থাকে না। ওস্তাদী হিন্দী গানের এই রসটি আস্বাদ করবার জন্যে এক শিক্ষার দরকার। সে শিক্ষাটুকুর বর্ণপরিচয় হতে হতেই লোকের ভাল লাগতে আরম্ভ করে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস; কারণ আমরাও তার বড় বেশিদূর এগোই নি। আজ তার প্রথম ভাগের কতকগুলি মূলসূত্র তোমাদের ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে। যাঁদের কাছে তা পূর্বপরিচিত, তাঁরা পুনরাবৃত্তি মার্জনা করবেন।

আমাদের সকল শাস্ত্রেরই মূল যেমন বেদে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়, সংগীতশাস্ত্রেরও তাই। ঋগ্বেদের মন্ত্র যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত নামে তিনটি স্বরে উচ্চারিত হত এবং আজও হয়ে থাকে, যাঁরা পণ্ডিতের মুখে তা না শুনেছেন, তাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্লোকপাঠে তার কতক পরিচয় পেতে পারেন। সামবেদও এখনও গীত হয়, কিন্তু ঠিক পূর্ব সুরে কিনা জানি নে। এবং দুঃখের বিষয় সে গান কখনও শুনি নি, তাই তোমাদেরও তার নমুনা শোনাতে পারলুম না। এই বৈদিক ত্রিস্বর থেকেই ক্রমশঃ আমাদের বর্তমান সপ্তস্বর সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত হয়েছে। য়ুরোপীয়দের আধুনিক বিচিত্র সংগীতও তাদের পূর্বতন ধর্মযাজকদের মন্ত্রপাঠের স্বরগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পৌরাণিক যুগে লবকুশের রামায়ণগান লোকপ্রসিদ্ধ; ও তত্তদিনে

বোধহয় সাতটি শুদ্ধ স্বরের অভিব্যক্তি হয়েছিল। বড়ই আপসোসের বিষয় যে, আমাদের ঐতিহাসিক স্পৃহা তত প্রবল না হওয়াতে এবং স্বরলিপির প্রচলন পূর্বে না থাকাতে, এই সব আদিম গানের কোনো প্রতিধ্বনি কলিযুগ পর্যন্ত এসে পৌছয় নি। বৌদ্ধযুগান্তে ব্রাহ্মণ্য যুগের পুনরভ্যুত্থানের সময় যে সংগীতের যথেষ্ট প্রচলন ও সমাদর ছিল, তার প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যাদিতে পাওয়া যায় মাত্র। সংগীতশাস্ত্রকে গন্ধর্ববেদ ও পঞ্চমবেদ বলে উল্লেখ করা হত, এবং ব্রাহ্মণ নাট্যাচার্যদ্বারা তা রাজ-অন্তঃপুরেও শেখানো হত—এর থেকে সে সম্মানের মাত্রা বোঝা যায়। তা ছাড়া দেবলোকে যে বিদ্যার জন্ম, সরস্বতীদেবী যার অধিষ্ঠাত্রী, নারদ যার দ্বারা হরিগুণ কীর্তন করেন, অপ্সরাগণ যার সাহায্যে দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যার টানে তাঁর ভক্তদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন বলে পুরাণের কথন, সে বিদ্যাকে যদি আমরা হেয়জ্ঞান করে থাকি ত সে নিতান্তই আমাদের অধঃপতনের ফলে। তবু আমরা অত্যন্ত স্থিতিশীল ও অতীতভক্ত জাত বলে, মুখে মুখে এতকাল পরেও যে অন্ততঃ মুসলমান আমলের সংগীতপদ্ধতি কথঞ্চিৎ রক্ষিত হয়েছে, সে আমাদের ওস্তাদবংশপরম্পরার কৃপায়, এবং সেজন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

মুসলমানগণ তাঁদের সঙ্গে কোনো জাতীয় সংগীতপদ্ধতি এনেছিলেন কিনা জানি নে। তাঁরা সে সময় কিছু রূঢ়প্রকৃতির ছিলেন, এবং গানবাজনা নাট্যোল্লাসের পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই শোনা যায়। তবে দক্ষিণে, যেখানে মুসলমানপ্রভাব কম, সেখানে সংগীতের রূপ সম্পূর্ণ না হোক, অনেকটা ভিন্ন বলে, মনে হয় যে হয়তো সেইটেই আমাদের আদিসংগীতের বংশধর এবং আর্যাবর্তের প্রচলিত সংগীত মুসলমান ও হিন্দুসংগীতের সংমিশ্রণের ফল। একেবারে অনার্য সংগীতের আভাস পাহাড়ী-গানে পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য স্বরলিপি এবং ইতিহাসজ্ঞানের অভাবে এ সমস্তই আনুমানিক সিদ্ধান্তমাত্র। দক্ষিণী বা কর্ণাটী সংগীতের ঢঙ আমার তো মন্দ লাগে না,

তবে ওস্তাদী গোঁড়ামির কাছে খাঁটি উত্তর-হিন্দুস্থানী সংগীত ছাড়া আর সবই শঙ্করপর্যায়ের অন্তর্গত।

অনেক দক্ষিণী গান শুনতে শুনতে বোঝা যায় যে, উত্তরের সঙ্গে মোটামুটি কতকগুলি প্রভেদ এই যে, ওদের সুর-তাল আমাদের চেয়ে হাল্কা ও একটু দ্রুত; এবং প্রত্যেকবার পুনরাবৃত্তির সময় ওরা একটু-একটু করে ছোট ছোট তান দিয়ে সুরের বিস্তার করে, তাকে বলে পল্লবী, অনুপল্লবী ইত্যাদি। ওদের রাগের নাম এবং রূপও আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। পূর্ব-ভারতে যেমন বাংলা, পশ্চিম-ভারতে তেমনি মহারাষ্ট্রী সংগীতও প্রচলিত। কিন্তু হিন্দুস্থানই হিন্দুসভ্যতার বাস্তভিটা, সেইজন্য হিন্দুস্থানী সংগীতই সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন সংগীতের অনেক পুঁথিগত শাস্ত্র আছে, যথা শার্ঙ্গদেবকৃত সংগীত-রত্নাকর, সোমেশ্বরকৃত রাগবিবোধ, অহোবলকৃত সংগীতপারিজাত ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৺শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতানুরাগী বাঙালীগণ এইসব সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও সারসংগ্রহ করে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়ে আমাদের উপকার করেছেন। এর মধ্যে কৃষ্ণধনবাবুর গীত-সূত্রসার গ্রন্থের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় আছে, তাতে বিশ্বাস হয়েছে যে তাঁর মত সমদর্শী, প্রাজ্ঞ, ও প্রাঞ্জল লেখক যে-কোনো দেশেই দুর্লভ। তিনি কোনো-একটি বিষয়ের আশপাশ সবদিক দেখে ও দেখিয়ে, বিবেচনা ও যুক্তিপূর্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাতে আনাড়ির মনও স্বভাবতঃ সায় দেয়; কারণ যে-বিষয় কিছু জানি তার সম্বন্ধে কোনো লোক যদি যুক্তিসংগত কথা বলছে দেখতে পাই, তাহলে যে-বিষয় জানি নে সে-সম্বন্ধেও তার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি আস্থা হয়। সুতরাং যিনি সংক্ষেপে হিন্দুসংগীতসম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁকে কৃষ্ণধনবাবুর গীতসূত্রসার দুই খণ্ডের আলোচনা করতে বলি। প্রথম খণ্ডে সংগীত-শাস্ত্র এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সংগীত-

কর্তব সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা জানাই শৌখিন সংগীত-চর্চার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বলেন, প্রাচীন পুঁথি থেকে আধুনিক হিন্দু-সংগীতশিক্ষার উপদেশ কমই পাওয়া যায়। অতএব তা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া অনাবশ্যক। সে কথা সত্য, কারণ লক্ষ্মী যেমন বাণিজ্যে বাস করেন, সংগীত-সরস্বতী তেমনি সুগায়কের শ্রীকণ্ঠে বাস করেন,—পুঁথির পত্রে নয়। তবে ধর্মপুরাণের অনেক কথা যেমন আমরা একালে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও শুনতে ভালবাসি, তেমনি সংগীত-পুরাণের কতকগুলি কথা বর্তমান সংগীতশিক্ষার কাজে না লাগলেও শুনতে ভাল লাগে। যথা—রাগরাগিণীর দেবমূর্তির কল্পনা। তাঁদের ভক্তরা যথারীতি স্মরণ করলে তাঁরা গায়কের রাগালাপে নিজমূর্তি ধারণ করেন। এই ধ্যানমূর্তি এতই পরিস্ফুট যে, সংস্কৃত শ্লোকে তার পরিষ্কার বর্ণনা আছে ও সেই অনুসারে ছবি পর্যন্ত আঁকা হয়েছে।

এই বিশ্বাসই বোধহয় আর একটি পৌরাণিক বিশ্বাসের মূল,—অর্থাৎ তাঁরা যখন দেবতা, আমরা যখন-তখন ডাকলে চলবে না, তাঁদের অবকাশমত ডাকা চাই; তাই বিশেষ সময়ে বিশেষ রাগ গাইবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা—সকালে ভৈরব, দুপুরে সারঙ্গ, বিকেলে মুলতান, রাত্রে বেহাগ ইত্যাদি।

কৃষ্ণধনবাবু অতি অশাস্ত্রীয় প্রকৃতির লোক, সুতরাং তিনি অবশ্য এর আধুনিক ব্যাখ্যা এই দেন যে, সেকালে রাজবাড়িতে প্রহরে প্রহরে বৈতালিকদের গান হত, তাই একঘেয়ে বা এলোমেলোভাবে না গেয়ে তারা বিশেষ সময়ের জন্যে বিশেষ রাগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যে-সময় যেটি শোনা অভ্যাস, সেই সময় সেটি শুনলে যে ভাল লাগে, সে বিষয় তো আমরাও আজকাল সাক্ষ্য দিতে পারি। শাঁখ বাজানোর সঙ্গে আমাদের মনে যে মঙ্গলভাব জড়িত, রসুনচৌকির আওয়াজ শোনবামাত্র বিবাহ-উৎসবের যে আনন্দ আমাদের মনে জেগে ওঠে, তা কি অপর কোনো দেশের লোকের হওয়া সম্ভব?—বিশেষতঃ শব্দের স্মৃতিউদ্দীপনী-শক্তি প্রসিদ্ধ। তাই শুনতে

শুনতে আমাদেরই সকাল-সন্ধ্যার রাগ সময়ে শুনলে যত ভাল লাগে, অসময়ে তত ভাল লাগে না ;—ওস্তাদদের ত কথাই নেই। সংগীতসম্বন্ধে আর একটি কৌতুকাবহ কিংবদন্তি এই যে, বিশেষ-বিশেষ রাগের বিশেষ ক্ষমতা আছে, যথা—দীপক গাইলে আগুন জলে ওঠে, মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে ইত্যাদি। প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্পও প্রচলিত আছে। সপ্তস্বর সাতটি জীবের কণ্ঠস্বর থেকে গৃহীত বলে সেকালে আর এক ধারণা ছিল, যথা—ময়ূর থেকে সা, বৃষ থেকে রে, ছাগল থেকে গা, বক থেকে মা, কোকিল থেকে পা (এখনো সেইজন্য কবিরা বলেন কোকিল পঞ্চমে গায়) অশ্ব থেকে ধা এবং হাতী থেকে নি।

সেকালের লোকেরা কিছু অধিক কল্পনাপ্রবণ ছিলেন বলে তাঁদের লেখার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করা একটু শক্ত। তাই বলে মনে কোরো না যে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের সবই অতিরঞ্জিত এবং অনাবশ্যক জল্পনা। সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করবার দিকে হিন্দু-মনের যে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, সংগীতশাস্ত্রেও নিশ্চয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে কালে অনেক পরিবর্ত্তন এবং সেই সঙ্গে উন্নতিও হয় বলেই বলছিলুম যে, তাঁদের সব সিদ্ধান্ত আমাদের কালের উপযোগী নয়। কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, বিশেষতঃ রাগ-তালের বিবরণ, যাতে একালের নজির পাওয়া যায়, এবং যা না জানলে আধুনিক হিন্দুসংগীতসম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা হয় না। যেমন কিছু ব্যাকরণ না জানলে ভাষাজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

রাগ কাকে বলে জান?—জানলেও বোঝানো শক্ত; যেমন 'প্রাণ' কথাটার মানে আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু বোঝাতে হলে ফাঁপরে পড়ে যাই। আমি বড় জোর বলতে পারি যে, আমাদের দেশের গানের সুর রাগরাগিণী নামক কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। তার কাজ হচ্ছে প্রতি সুরের জাতি-পরিচয় দেওয়া। যেমন মানুষমাত্রেরই পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে, অথচ গঠন রঙ আচার ব্যবহার বেশ ও নিবাস অনুসারে তারা বিশেষ বিশেষ জাতিতে

বিভক্ত ;—তেমনি গানের সুরমাত্রই সপ্তস্বরের লীলা, কিন্তু সেই স্বরগুলি সাজাবার তফাতে রাগের তফাৎ হয়। এই উপমার একটু বিশেষ উপযোগিতা এই যে, কৃষ্ণধনবাবুর মতে এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ সুর থেকেই বিভিন্ন রাগিণীর উৎপত্তি হয়েছে। কথাটা যুক্তি-সংগত বলে বোধ হয়, কারণ অনেক রাগিণীর দেশের নামে নাম, যথা—সিন্ধু, গুর্জরী, মুলতান, সুরট ইত্যাদি। একই রাগে অনেক গান হতে পারে, তাই শ্রেণী নাম দিয়েছি ; কিন্তু সেই রাগের বিশেষ লক্ষণ সবগুলিতে থাকা চাই। সে লক্ষণগুলি কি, তা চিনতে অনেক অভ্যাস এবং শিক্ষার দরকার। প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েরের অঙ্কিত একটি হঠাৎ-নবাব ৪০ বৎসর বয়সে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, এতদিন ধরে তিনি যে-ভাষায় কথা কয়ে আসছেন, তাকেই বলে গদ্য! আমরাও হয়তো যে-সব চলিত বাংলা গান গেয়ে আসছি, অজ্ঞাতসারে তার রাগতাল বজায় রেখেই গেয়ে থাকি। যেটা অজ্ঞানে অনেক সময়ে করি, সেইটেই জ্ঞাতসারে করবার পদ্ধতির নাম শিক্ষা। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, রাগতাল বুঝলেই কি গান বেশি মিষ্টি লাগবে ?—যেহেতু শেক্সপীয়র বলে গেছেন যে, অপর কোন নাম দিলেও গোলাপের গন্ধ সমানই মধুর হত! কিন্তু রাগরাগিণীর সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় না থাকলে আমার মনে হয় আমাদের দেশের গান সম্পূর্ণরূপে ভাল লাগবার ব্যাঘাত ঘটে ; যেমন জাতিভেদসম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকা আমাদের দেশের লোককে ভাল রকমে চেনবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ;—রাগবিচার ও জাতবিচার দুই প্রথাই আমাদের এমন মজ্জাগত। তা ছাড়া শুধু গাইবার জন্য ততটা না হোক, গান রচনা করবার জন্যে বা গুণীর গুণপনার মাত্রা বোঝবার জন্যে রাগবোধ কিছু থাকা নিতান্ত দরকার।

অবশ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদের রাগরাগিণীসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেবার অসাধ্য-সাধন করতে চাই নে। তবে এইটুকু মোটামুটি বলে

রাখি—যা অনেকেই আগে শুনে থাকবেন—যে, প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রমতে ছয় রাগ, ও ছত্রিশ রাগিণী তাঁদের স্ত্রীস্বরূপা; তা ছাড়া পুত্রপৌত্রেরও অভাব নেই। আধুনিক মতে ছয় ঋতুর সঙ্গে ছয় রাগের যোগ থাকা খুব সম্ভব। কিন্তু রাগিণীর সঙ্গে তাঁদের জবরদস্তি বহুবিবাহে আবদ্ধ না করে স্বাভাবিক সাদৃশ্য অনুসারে রাগরাগিণী শ্রেণীবদ্ধ করলেই বোঝবার পক্ষে সহজ হয়। মুসলমান আমলে এই প্রকার সাদৃশ্যমূলক শ্রেণী-বিভাগই করা হয়েছিল, যথা—অষ্টাদশ কানাড়া, ত্রয়োদশ তোড়ি, দ্বাদশ মল্লার, নব নট, সপ্ত সারঙ্গ। কিন্তু এর অনেক রাগিণীই স্বরলিপি-অভাবে লোপ পেয়েছে। নানা মুনির নানা মতের ভিতর সংগীতশাস্ত্রে ভরত ও হনুমন্তের মতই প্রধান। ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক, এবং আদি নাট্যকার বলেও প্রসিদ্ধ। হনুমন্ত আমাদের আবাল্য-সুহৃৎ পবননন্দন কি না তা বলা যায় না, তবে ঐ নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এটুকু নিশ্চিত। এঁদের কারও মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় নি; পূর্বে যে গ্রন্থকারদের নাম করেছি, তাঁরা এঁদেরই অসম্পূর্ণ প্রচলিত মত সংগ্রহ করেছেন মাত্র। সেই জন্য মতের অনৈক্যও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ওস্তাদী সংগীতচর্চার পক্ষে, যে-বিষয় সকলে একমত, তার কিছু কিছু জানাই যথেষ্ট।

আমাদের গানের সাধারণ কতকগুলি লক্ষণের মধ্যে একটা এই যে, বার বার প্রথম থেকে পুনরাবৃত্তি হয় ও ঠিক শেষে শেষ হয় না, কিন্তু সম নামক তালের একটা বিশেষ ঝোঁকে শেষ করতে হয়। আর-একটা এই যে, রচয়িতার নাম শেষভাগে দেওয়া থাকে, তাতে লিপিবদ্ধ করবার অন্তত একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরো একটা এই যে, মুখে মুখে শেখা ও শেখানো হয়, তাই স্মরণ-শক্তি থাকা খুব আবশ্যক। আর রাগরাগিণীর কথা তো পূর্বেই বলেছি।

রাগের যেমন প্রকারভেদ আছে, আমাদের গানেরও তেমনি প্রকারভেদ আছে—তবে অত নয়। উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সংগীত মোটামুটি তিন প্রকার,—ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। কথা ও তাল বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি নিরর্থক

শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাগের রূপ দেখানোর একটা পদ্ধতিও আছে, তাকে বলে আলাপ করা। সন্ধ্যাবেলা গানের বৈঠক বসলে ওস্তাদরা প্রায়ই ইমনকল্যাণের আলাপ করে সেই রাগিণীর গান ধরেন—কেন জানি নে। ইমন পারস্যদেশ থেকে এসেছে শুনতে পাই, তাই হয়তো মুসলমান বাদশারা তাকে এই সম্মানের আসন প্রদান করেছিলেন।

মুসলমানরা আসবার আগে থেকেই উত্তরপশ্চিমে ধ্রুপদের প্রচলন ছিল। ধ্রুপদে চারটি কলি বা ভাগ থাকে—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। পাখোয়াজে যে-সব ভারি ভারি তাল বাজানো হয়, যথা চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল ইত্যাদি, তাতেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়। ধ্রুপদের কথার ভাবও গম্ভীর। যাদের কেবল ধ্রুপদ গাওয়া অভ্যাস ও ব্যবসা, হিন্দুস্থানে তাদের বলে "কালাবঁৎ" অর্থাৎ কলাবন্ত। স্বনামধন্য তানসেন ধ্রুপদের গায়ক ও রচয়িতা ছিলেন, এবং আকবরের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাকি আগে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তাঁর আগে নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরা, এবং পরে ঢুঁদি খাঁ ও সুরদাস ভাল ধ্রুপদ-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ।

খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বাদশা মহম্মদ শা ধ্রুপদ শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে সুগায়ক সদারঙ্গকে নতুন কোনোরকম গান তৈরি করতে আদেশ করেন,—ফলে জন্মাল খেয়াল। কেউ বলেন, তার পূর্বে সুলতান হোসেন নামে জোয়ানপুরের এক নবাব খেয়াল সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণধনবাবুর মতে কোনো বিশেষ ব্যক্তি কোনো বিশেষ সময় খেয়ালের সৃষ্টি করেন নি; কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরকম গান পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল, সুলতান হোসেন হয়তো তাকে জাতে তুলে নিয়েছেন। কারণ কথাটার মানে থেকেই বোঝা যায় যে, তখনকার সভ্য ওস্তাদসমাজ খেয়াল জিনিসটাকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত। যাই হোক, খেয়াল ধ্রুপদের চেয়ে সংক্ষেপ; এবং প্রায় দুই কলিতেই সম্পূর্ণ—আস্থায়ী ও অন্তরা। তার বেশি থাকলেও

সুর অন্তরারই মত হয়। রাগরাগিণীসম্বন্ধে খেয়াল-ধ্রুপদে বিশেষ তফাত নেই, তালে আছে। কাওয়ালি, একতালা, ঝং প্রভৃতি খেয়ালের তাল।

রাগসম্বন্ধে যেমন, তালসম্বন্ধেও তেমনি অতি মোটা দু-একটি কথা ছাড়া এখানে কিছু বলবার সময় বা স্থান নেই। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, একই ছন্দের অনেক তাল ঢিমা করে গাইলে ধ্রুপদের তাল হয় এবং মাত্রা অর্ধেক করে নিলে খেয়ালের তাল হয়, নামও বদলায়। কিন্তু আসল প্রভেদ এই যে, খেয়ালে যেরকম ছোট ছোট তান গিটকিরি ব্যবহার হয়, ধ্রুপদে তা হয় না; এবং ধ্রুপদে যে-রকম গমক ব্যবহার হয়, খেয়ালে তা হয় না। খেয়ালের তাল যেমন অপেক্ষাকৃত লঘু, ভাবও তাই। যেরকম অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অনেক খেয়াল রচিত হয়, তা শুধু হিন্দী কথার মিষ্টতার গুণে পার পায়। যথা—কারো পান খেয়ে ঠোঁট লাল হয়েছে, কারো শাড়ি রঙিয়ে বা চুড়ি মাজিয়ে দিতে হবে, কারো নূপুর বাজছে, কারো ননদী বকছে। হিন্দী খেয়ালরচয়িতার মধ্যে সদারঙ্গ ও আধারঙ্গ বিখ্যাত।

টপ্পা খেয়ালের চেয়ে আরো সংক্ষেপ, আরো হাল্কা এবং আরো তানযুক্ত। কথায় কথায় তান। এ সম্বন্ধেও এই একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, সদারঙ্গের এক সাকরেদ গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে খেয়ালের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁরই ছেলে গোলাম নবী, শোরী নামক এক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে উদ্দেশ করে যে-সব গান রচনা করেন, তারই নাম টপ্পা। শোরীর টপ্পা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত, সেটা ঠিক; এবং শোরীর নামও শেষে উল্লিখিত আছে, তাতে অনেকের মনে হয় যে শোরীমিঞাই বুঝি রচয়িতা। টপ্পারও খেয়ালের মত কেবল এক আস্থায়ী ও অন্তরা, এবং খেয়ালের প্রায় সকল তালই তাতে ব্যবহৃত হয়; শোরীর টপ্পা অধিকাংশ মধ্যমান তালে। কেবল রাগিণীতেই খেয়ালের সঙ্গে টপ্পার প্রভেদ। টপ্পা আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত বলে—কাফী, পিলু, বারোঁয়া, ঝিঁঝিঁট, লুম প্রভৃতি আধুনিক রাগে রচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন রাগের মধ্যে ভৈরবী, খাম্বাজ,

কালাংড়া, দেশ ও সিন্ধুই ব্যবহৃত হয়। টপ্পার হাল্কা তান গিটকিরির সঙ্গে ভারি রাগ, তাল বা ভাব খাপ খায় না।

এই তিনরকম গানের মধ্যে যে ওস্তাদ যে ঢঙের সাধনা করেছেন, সেই প্রকার গানই গেয়ে থাকেন, কারণ অভ্যাসবশতঃ সেই এক ধরণই তাঁর গলায় সহজে আসে। পরস্পরের রাগতাল ব্যবহার না করার দরুন এই তিনটি রীতি একেবারে পৃথক হয়ে পড়েছে।

ঠুংরী নামে আর এক প্রকার গানও হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে, তা টপ্পার রাগিণীতে গাওয়া হলেও, তাল ও সুরের বৈচিত্র্যবশত: স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। একই গানে সুকৌশলে একাধিক রাগিণী এবং রীতি মিশিয়ে এই বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। ওস্তাদী গোঁড়ামির কাছে সেটা অবৈধ বা শ্রুতিকটু বোধ হলেও, সাধারণ শ্রোতার কাণে মিষ্টি লাগে। আমার বোধ হয় আমাদের আজকালকার অনেক মিশ্র সুর ঠুংরীশ্রেণীভুক্ত।

গান সম্বন্ধে এত কথা বললুম বলে মনে কোরো না যে গানই সংগীতের সর্বস্ব। সংস্কৃতে সংগীত বলতে নৃত্যগীতবাদ্য তিনই বোঝাত; এখন তার অর্থ সংকীর্ণ হয়ে কেবল গানে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কণ্ঠকে যদিও শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বলা হয়েছে, তবু মানুষের হাতে গড়া বহুতর যন্ত্র আছে যা কথাকে অতিক্রম করে আমাদের মনে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর ভগবান ভাল গলা না দিলে ভাল গাইয়ে হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু চলনসই সুরবোধ থাকলেই যত্ন ও চেষ্টাপূর্বক ভাল বাজিয়ে হওয়া যেতে পারে।

বৈদিক যুগেও যন্ত্রের অভাব ছিল না, কারণ ম্যাকডনেল সাহেব বলেন, বাঁশি বাজানো, বীণা-বাজানো, ঢোল-বাজানো প্রভৃতি পেশার উল্লেখ বেদে আছে। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে চারপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের নাম—তত বা তারের যন্ত্র, যেমন সেতার; বিতত বা চামড়ার যন্ত্র, যেমন খোল; ঘন বা কাঁসার যন্ত্র, যেমন মন্দিরা; এবং শুষির বা বায়বীয় যন্ত্র যেমন বাঁশি। আমাদের সর্বপ্রধান যন্ত্র অবশ্য বীণ বা বীণা, যার নাম শুনতে দেশবিদেশে কারো বাকি

নেই, যদিও আওয়াজ বোধহয় অনেকেই শোনেন নি। অন্যান্য প্রাচীন পদ্ধতির ন্যায় বীণবাজানোর রেওয়াজও এখন মাত্রাজে বেশি। ডান হাতের সব আঙুল দিয়ে বাজাতে হয় বলে শুনেছি বীণা বাজানো বড় শক্ত। তানপুরা বা তম্বুরাও বহু প্রাচীন যন্ত্র এবং আজ পর্যন্ত ওস্তাদী গানের প্রধান সহায়। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার এক শিষ্য ছিলেন তুম্বুরু; নামের সাদৃশ্যে মনে হয় তাঁর সঙ্গে এ যন্ত্রের কিছু যোগ আছে। আমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেতার ও এস্রাজই বেশি চলিত ও বাজানো সহজ। গানের সংগতের জন্য এখনকার কালে তম্বুরার চেয়ে এস্রাজই বেশি উপযোগী বলে আমার বোধ হয়—বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে যাঁরা গান করেন, তাঁদের সকলকেই আমি এস্রাজ শিখতে অনুরোধ করি। কারণ এস্রাজ হাল্কা, মিষ্টি ও একটানা, সুতরাং সংগতের যন্ত্রের সব গুণই ওতে বর্তমান। তানপুরা যন্ত্রটা কিছু বেশি ভারি, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস না থাকলে তার সঙ্গে গাওয়াও শক্ত। সেতারের বড় ভাইয়ের নাম সুরবাহার। সে যন্ত্রটি দেখতে বেশ সুন্দর, আওয়াজও সেতার অপেক্ষা প্রবল। কিন্তু তাতে শুধু আলাপই বাজানো হয়, তাই খুব ভাল বাজিয়ে ছাড়া কেউ বড় বাজায় না। গৎ বাজাবার পক্ষে হরেদরে সেতারই সবচেয়ে ভাল। শুনতে পাই আলাউদ্দীনের সমসাময়িক আমীর খস্রু নামক একজন সংগীতগুরু সেতারযন্ত্রের স্রষ্টা, এবং তার সঙ্গে বাজাবার জন্যেই তিনি পাখোয়াজ ভেঙে বাঁয়া-তবলা নির্মাণ করেন। আমাদের ছেলেরা বাঁয়া-তবলা শেখবার দিকে একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়। তাতে তালজ্ঞানও যেমন হয়, সঙ্গের গানবাজনাও তেমনি জমিয়ে তোলে। য়ুরোপীয় যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের যন্ত্রের তফাৎ এই যে, ওদের প্রধান যন্ত্র পিয়ানোর আওয়াজ এত জোরালো যে, অনেক বড় জায়গায় অনেক লোকে একত্র বসে শুনতে পারে। আর আমাদের প্রধান যন্ত্র সেতারের আওয়াজ এত মৃদু যে, একটি ছোট ঘরে কেবল জন-কুড়ি লোক বসে শুনলে তবেই তার রস পাওয়া যায়। তাও যদি অন্ধকার ও

নিরালা হয় তবে আরো ভাল ;—চাঁদের বা তারার আলোর চেয়ে বেশি তীব্র আলোতে যেন সে ধ্বনি খোলে না, বিজলিবাতি এবং অমনোযোগী লোকের ভিড় ও কষ্টে চাপা হাসিকথার গুঞ্জনে তো একেবারেই মরমে মরে যায়—এত সুকুমার তার প্রাণ, এত ক্ষীণ তার কায়া।

বেদের সময় থেকে মুসলমান আমল পর্যন্ত যখন হিন্দুসংগীতের নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল, তখন মুসলমান আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এক-একটি বিশেষ খণ্ড-শিল্প অবিকৃত ভাবে অমর হয়ে থাকতে পারে বটে, যথা কালিদাসের শকুন্তলা কিংবা তানসেনের কোনো গান (যদি লেখা থাকত)। কিন্তু শিল্পকলার আদর্শ যুগে যুগে বদলাতে বাধ্য, কারণ সেটি সমাজের তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ—এবং সমাজ সচল পদার্থ, স্থাণু নয়। তাই ইংরেজরাজের আগমনের পর থেকেও হিন্দুসংগীতের অনেক বদল হয়েছে ও হচ্ছে। তাকে কেউ বলবে উন্নতি, কেউ বলবে অবনতি, কিন্তু তার পরিণতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

ব্রাহ্মসমাজের গান একটি ভাণ্ডারবিশেষ, যেখানে কালাবঁতী ধ্রুপদ থেকে হাল্কা টপ্পার সুর, কীর্তনবাউল থেকে আধুনিকতম মিশ্রসুর পর্যন্ত সবরকম রীতির নমুনা সঞ্চিত আছে। সুতরাং যিনি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের গানের ক্রমবিকাশ অনুশীলন করতে চান, তাঁর পক্ষে ব্রহ্মসংগীত আলোচনা প্রশস্ত।

ইংরেজ-আমলের একটি নূতন রীতি হচ্ছে, তম্বুরার বদলে হারমোনিয়মের সঙ্গে গান গাওয়া। মধ্যে তার যত চল হয়েছিল, আজকাল তাতে কিছু ভাঁটা পড়ে গেছে; কারণ ইংরেজ-প্রভাবের প্রথম ধাক্কায় যত প্রাচ্যবর্জন এবং পাশ্চাত্যগ্রহণের দিকে ঝোঁক পড়েছিল, কিছুদিন থেকে তার বিপরীত স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অভ্যস্ত জিনিস ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না, বিশেষতঃ যদি তার কিছু সুবিধে থাকে। হারমোনিয়মসম্বন্ধে সম্প্রতি

যে বিরুদ্ধভাব জেগেছে, ইংরেজই বোধহয় তার প্রবর্তক এবং আমরা কেউ কেউ তার অনুমোদকমাত্র। আমিও এই বিদ্রোহীদলের একজন, তবে একই কারণে কি না জানি নে। ভাল হারমোনিয়মের ভাল বাজনা আমাদের আধুনিক গানের অনুপযোগী সংগত বলে আমি মনে করি নে। কিন্তু অধিকাংশস্থলে যেরূপ নিকৃষ্ট যন্ত্রে কর্কশ আওয়াজ বের করা হয়, তাতে আমাদের গান ঢেকে ফেলে ও নষ্ট করে দেয়। পিয়ানোতেও নিতান্ত হাল্কা নাচুনে দেশী গান ভিন্ন বাজানো চলে না; সুতরাং বেয়ালা কিংবা এস্রাজের টানা মোলায়েম আওয়াজই আমাদের সংগতের পক্ষে সাধারণতঃ উপযুক্ত।

যন্ত্র ছেড়ে দিয়ে গানের প্রতি দৃষ্টি করলেও বিদেশী প্রভাব লক্ষিত হবে। থিয়েটারের সাধারণ গান ও কন্সার্টে তার খোলো পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তাতে কেবল ইংরেজী চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাণ্ডের নকল করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর হাসির গানে যে ইংরেজী কায়দা মিশিয়েছেন, তা বিষয়ের উপযোগী ও ভাবের সহায় বলেই আমার বিশ্বাস। স্বদেশী গানে যে ধুয়া, বা গানের প্রত্যেক কলির শেষভাগ হাল্কা সুরে একসঙ্গে গাওয়ার ইংরেজী রীতি প্রচলিত হয়েছে, তার সূত্রপাত আগে হলেও দ্বিজেন্দ্রলালই তার বহুলপ্রচার করেছেন। তাঁর স্বদেশী গান অনেকে একত্রে গাইতে পারবে বলে বোধহয় তিনি ইচ্ছা করেই তাতে সাদা ইংরেজী-ঢঙের সুর বসিয়েছেন। কিন্তু শুনতে পাই যে তা সত্ত্বেও আমাদের দেশী রাগিণী ঠিক বজায় আছে। এবং তিনি যে দেশী রাগতাল বিলক্ষণ বুঝতেন ও নিজে বিশুদ্ধভাবে গাইতে পারতেন, তা তাঁর ও তাঁর গানের ভক্তমাত্রেই জানেন। রবীন্দ্রনাথও আমাদের গানে নানা নূতনত্বের প্রবর্তন করেছেন। তাঁর গানে ইংরেজী সুরের ছায়াও পাওয়া যায়, মিশ্র সুরেরও তিনি কিছু পক্ষপাতী। তার জন্যে লোকে নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক, তাঁর অনেক গান আমাদের সংগীতের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে ও এত প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে পরিচয়পত্র অনাবশ্যক। বিশেষতঃ আজকাল স্বরলিপি হওয়াতে গানকে বেঁধে

রাখবার উপায় পাওয়া গেছে। এখন আর ফাঁকি দিয়ে গানের পাখী উড়ে যাবার জো নেই। তার ডানা কেটে তাকে মেপেজুখে খাঁচায় পোরবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাতে একটু শ্রীভ্রষ্ট হলেও, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে ভাল। স্বরলিপির নানা পদ্ধতির মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভাবিত প্রণালীদ্বয়ই বেশি প্রচলিত। আজকাল অনেকে মিলে একত্রে সংগীতচর্চা করবার দিকে যে ঝোঁক হয়েছে, তার ফলে অনেক যন্ত্র একসঙ্গে বাজানো এবং সব সময়ে একসুরে না বাজিয়ে আলাদা আলাদা সম্বাদী সুরে বাজানোর চেষ্টাতে য়ুরোপীয় হারমোনি বা স্বরসন্ধির প্রভাব লক্ষিত হয়। একজন লেখক একে সংগীতের "গোড়ে মালা গাঁথা" বলেছেন, অর্থাৎ একহারা মূল সুরের সঙ্গে অন্যান্য সুর এমনভাবে যোজনা করা, যাতে সবসুদ্ধ শ্রুতিমধুর হয়।

ফলতঃ, আমাদের যন্ত্রের উন্নতি করবার দিকে দেশের লোকের তেমন ঝোঁক না দেখা গেলেও, সৌভাগ্যবশতঃ গানের চর্চা থেমে যায় নি, বরং বেড়েই চলেছে। অনতিপূর্বে সংগীতকে যেমন অবহেলার চক্ষে, কিংবা কেবল পেশাদারের উপযুক্ত বলে ঘৃণার চক্ষে দেখা হত, কিছুদিন থেকে সে রেওয়াজ উঠে গেছে ও সে-অবজ্ঞার বদলে অনুকূল হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে; কতকগুলি সংগীত-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, সেটি সুখের বিষয়। আধুনিক বাপ-মা ছেলেমেয়েকে গানবাজনা শেখাবার জন্যে ব্যস্ত; রাতারাতি তাদের ওস্তাদ করে তুলতে চান এবং অনেক সময়ই বিবেচনা করেন না তাদের ভিতরে সে ক্ষমতা আছে কি না। যাই হোক, ঔদাসীন্য অপেক্ষা উৎসাহ শ্রেয়, সে বিষয় সন্দেহ কি? আমাদের দেশের জীবন্ত শিল্পকলার মধ্যে সংগীতই প্রধান, সে কথা মনে রেখে আশা করি আমাদের দেশের লোকে—বিশেষতঃ মেয়েরা—এই মোহিনী-বিদ্যার চর্চা ও উন্নতির প্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখবেন।

এতক্ষণ যদিও ওস্তাদী হিন্দী গানের তরফে ওকালতি করলুম, কিন্তু

অবশেষে স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দী গান যতই ভাল হোক, বাংলা গান যেমন বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে প্রাণে গিয়ে পৌঁছতে পারে, অপর ভাষার গান কখনই তেমন পারে না। কারণ সুর ও কথা, এই দুই যাদুকরে মিলে তবে গানের পূর্ণ মায়া সৃজন করে। সুতরাং সংস্কৃত শিখলেও যেমন তার ভিতর দিয়ে ও তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলনই বাঙালীর পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয়; তেমনি হিন্দী গানের চর্চা আবশ্যক হলেও শেষে বাংলা গানেই তার ফসল ফলাতে হবে, বাংলা গানকেই বাঙালীদের সকলরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলতে হবে।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

হিন্দুসংগীত

হিন্দুসংগীত বলতে কি বোঝায়, সে-বিষয়ে দেখতে পাই প্রথমতঃ সাধারণ লোকের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই, দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভীষণ মতভেদ আছে।

অনেকের বিশ্বাস, আমরা যাকে ওস্তাদী বলি, তাই হচ্ছে খাঁটি হিন্দুসংগীত। কিন্তু নানা বিভিন্ন শ্রেণীর সংগীত এই ওস্তাদী বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট; যথা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি। শুদ্ধবাণী ধ্রুপদ ও শোরীমিয়ার টপ্পা যে একজাতীয় সুর নয়, আমাদের দেশের গান-বাজনায় যাঁরা ক-খ-মাত্র জানেন তাঁদের কাছেও তা অবিদিত নেই। সুতরাং 'ওস্তাদী' অর্থে কে কোন-জাতীয় সংগীত বোঝেন, তা স্পষ্ট করে না জানালে, এ বিষয়ে কোনরূপ সংগত বিচার করা অসম্ভব। যদি কেউ জোর করে বলেন যে, হিন্দুস্থানী-সংগীতই হিন্দুসংগীত, তাহলে দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণ-সংগীতাচার্যেরা সমস্বরে তার প্রতিবাদ করে বলবেন—না, তা কখনই নয়, কেননা উত্তরাপথের সংগীত যবনদোষে দুষ্ট—অতএব হিন্দুপদবাচ্য নয়।

অপরপক্ষে মুসলমান ওস্তাদজিরা বলে থাকেন যে, রাগরাগিণী সব তাঁদের খানদানি, এমন কি সপ্তসুর পর্যন্ত তাঁদের ঘরানা চিজ। হিন্দুর মুখ থেকে ওসব বেরোয় না, যদি-বা বেরোয় তাহলে তাতে 'কড়িভাতকা বদ্‌বু' থাকে; কিন্তু তাঁদের মুখ থেকে যা উদ্গীর্ণ হয়, তাতে 'পোলাও-কোরমাকো খোসবু' থাকে। একদিকে দই-ভাত, অপরদিকে পেঁয়াজ-রশুন—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি যে বেশি পূতিগন্ধময় সে বিচার তিনিই করতে পারেন—যিনি সংগীতের রূপ চিনুন আর না চিনুন, গন্ধ চেনেন। এ দেশে গীত যে অনেক গায়কের নাসারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়, তা জানি; কিন্তু তা যে শ্রোতাদেরও

উক্ত ছিদ্র দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে, এ কথা পূর্বে জানতুম না। ফলকথা, হিন্দুস্থানী সংগীত, সংগীত হতে পারে; কিন্তু হিন্দু কি না, সে বিষয়ে আচার্য ও ওস্তাদে মতের মিল নেই।

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দুসংগীত বলতে কি বোঝায়, তা নির্ণয় করা অসম্ভব, কেননা ও-শব্দে কোনও-এক জিনিস বোঝায় না। নানা বিভিন্ন জাতীয় নানা বিভিন্ন রীতির সংগীতকে আমরা ঐ এক ছাপমারা মোড়কে পুরে দিই; হিন্দুসংগীত বলে সংগীতের এমন কোনও একটি বিশেষ টাইপও নেই—যা অচল, অটল, পরিচ্ছিন্ন ও নির্বিকার। আমাদের দেশের গানবাজনাও মুখে মুখে ও হাতে হাতে নানা রূপ ধারণ করে নানা চালে চলছে। পরিবর্তনের নিয়ম এ ক্ষেত্রেও পূর্ণমাত্রায় কাজ করেছে। সুতরাং বর্তমানে কেউ যদি নূতন ঢঙের সুর গড়েন কিংবা পুরোনোকে নূতন চালে চালান, তাহলে তাতে করে হিন্দুসংগীতের ধর্ম নষ্ট করা হবে না।

২

পূর্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, হিন্দু-সংগীতের বিশেষত্বই এই যে, তার কতকগুলি সুপরিচিত টাইপ আছে—যার নাম ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। এবং সেই সব রাগরাগিণীর একসুর বদলালে হিন্দুসংগীত বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ কথাটারও একটু বিচার করা আবশ্যক। প্রথমতঃ হিন্দুসংগীতে শাস্ত্রমতে রাগরাগিণী অসংখ্য, মূল ছয় এবং তার থেকে উৎপন্ন ছয় ছক্ ছত্রিশ নয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওস্তাদজিরা যে ছকা ধরে বসে আছেন, তা যে ফাঁসকাগজ তাতে আর সন্দেহ নেই।

সত্য কথা এই যে, নামে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী থাকলেও, আসলে আমাদের গানবাজনায় তারা নানা মূর্তিতেই দেখা দেয়। এই কারণেই তো রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে ওস্তাদে ওস্তাদে এত মারামারি। ভৈরবীতে

কড়িমধ্যম লাগালে রাগ বজায় থাকে কি না, এ তর্কের অবশ্য কোনও অর্থ নেই। কড়িমধ্যমের স্পর্শে যদি ভৈরবীর ভৈরবীত্ব নষ্ট হয়, তাহলে তাকে না হয় 'কৈরবী'ই বলা গেল—তাতে সে সুর অসুর হয়ে ওঠে না। বাংলা-বেহাগের নিখাদ কোমল ও মধ্যম শুদ্ধ, অপর পক্ষে হিন্দুস্থানী-বেহাগের নিখাদ শুদ্ধ এবং মধ্যম তীব্র। এ উভয়ের মধ্যে কোন্ সুরটি হিন্দু আর কোন্‌টি অহিন্দু—এ বিচার কোন্ আদালত করবে ?

তারপরে শুদ্ধাশুদ্ধের এই বাজে তর্ক শুনে শুনে লোকের মনে আর-একটি ধারণা জন্মেছে যে, মিশ্র হলেই বুঝি সুরের সর্বনাশ হয়। যেমন গীতাকারের মতে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টির বাড়া পাপ নেই, তেমনি অনেক গীতকারের মতে মিশ্র সুরের সৃষ্টির বাড়া পাপ নেই। এ ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের ওস্তাদী ঢঙের টপ্পা-ঠুংরির অধিকাংশ সুরই তো মিশ্র। তারপর ধ্রুপদ-খেয়ালের অনেক ভারি ভারি গানের সুরও যে মিশ্র, তার পরিচয় তাদের নামেই পাওয়া যায়, যথা—মেঘমল্লার, গৌড়মল্লার, নটমল্লার, ইমনকল্যাণ, ইমনভূপালি, বসন্তবাহার, আড়ানাবাহার ইত্যাদি।

সুতরাং এই মিশ্র সুরের উপরেই আমাদের সংগীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত, এবং যে-সকল পূর্বাচার্যেরা সুরের নূতন রূপ নূতন গতি দিতে পেরেছেন, যথা—গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা, তানসেন, সদারঙ্গ ইত্যাদি,—ওস্তাদের দল অদ্যাবধি তাঁদের নাম উচ্চারণ করে নিজের কান মলেন, তার পরে মুখ খোলেন।

৩

এ সব তো গেল কালোয়াতি সংগীতের কথা, শাস্ত্রে যাকে বলে 'মার্গ'। এ ছাড়া ভারতবর্ষে আর এক-জাতীয় সংগীত বহুকাল হতে চলে আসছে যার নাম 'দেশী'। উদাহরণ—বাংলার কীর্তন, বাউল, সারি, জারি ইত্যাদি। গাইয়ে-বাজিয়েদের দেশীসংগীতের ইচ্ছামত রূপান্তর করবার প্রচুর স্বাধীনতা

আছে, কেন না এ শ্রেণীর সংগীত কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন নয়। এ কথার প্রমাণ 'রাগবিবোধের' বক্ষ্যমাণ শ্লোক—

দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জনহৃত্রঞ্জন তু সা দেশী।
স তু লোকরুচিবিকলিত প্রায়ো লক্ষ্যাত্র দেশী তৎ ॥

টীকাকার উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

যে সকল গীত অবলা-বাল-গোপাল-নৃপালগণ কর্তৃক অনুরাগবশতঃ স্বেচ্ছায় স্বদেশে গীত হয়, তাহাকে দেশী কহা যায়। মার্গসংগীত দ্বিবিধ—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। যে সংগীত আলাপনিবদ্ধ, তাহা মার্গ বলিয়া প্রকীর্তিত। আর যাহা আলাপাদিবিহীন, তাহাই দেশী বলিয়া প্রকীর্তিত।

আর এক কথা—শাস্ত্রের নিয়মে বদ্ধ নয় বলে, দেশী সংগীত যে সংগীতের নিয়মে বদ্ধ নয়, অবশ্য তা নয়। রাগবিবোধ গ্রন্থের উদ্দেশ্যই এই প্রমাণ করা যে, মার্গ এবং দেশীসংগীতে আসলে কোনও বিরোধ নেই। গ্রন্থকারের নিজের কথা এই "রাগবিবোধং বিদধে বিরোধ রোধায় লক্ষ্যলক্ষণয়োঃ"। উপরোক্ত বাক্যে লক্ষ্য অর্থ দেশী এবং লক্ষণ অর্থে মার্গ। এ দুয়ের মধ্যে যে বিরোধ নেই শুধু তাই নয়,—টীকাকারের মতে দেশীসংগীত মার্গ-সংগীতেরই একটি বিশেষ শাখা। এ শাখাকে যদি কেউ কাঁচা ডাল বলেন, তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তাই বলে সেটিকে যে ভাঙতেই হবে, এমন কোনও বিধি শাস্ত্রে নেই।

অতএব দেখা গেল যে, শাস্ত্রমতেও দেশীসংগীত আলাপাদিবিহীন হওয়ার দরুন বিদেশী হয়ে পড়ে না। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গান আলাপনিবদ্ধ নয় বলে যে তা হিন্দুসংগীত নয়, এ হতেই পারে না,—নচেৎ রামপ্রসাদী সুরকেও অহিন্দু বলতে হয়।

সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে দেশীসংগীতও হিন্দুসংগীত এবং নর্তনে কীর্তনে সে তার প্রাণের নিত্যনূতন পরিচয় দিচ্ছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কেননা রাগবিবোধের টীকাকার কল্লিনাথ—

সম্ভবতঃ ইনি মল্লিনাথের সহোদর—বলেছেন, দেশীসংগীত কামচারী। এ সংগীত অবশ্য সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এই দেশীসংগীতের হালচাল সম্বন্ধে বলেছেন—

প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী। কিন্তু সবচেয়ে আশার কথা—সে চলতে শুরু করেছে, সে বাঁধন মানছে না।

দেশীসংগীতের প্রাণ আছে বলে তার স্ফূর্তি কেউ বন্ধ করতে পারবে না, এবং করাও উচিত নয়। কালক্রমে আমাদের এই দেশীসংগীত হয়ত এক অপূর্ব মার্গসংগীতে পরিণত হবে—এ আশা অন্তত আমরা রাখি।

৪

যদি এদেশে কোনও সর্বাঙ্গসুন্দর সংগীত থাকে, আমার মতে সে হচ্ছে ঐ পূর্বোক্ত মার্গসংগীত। সকলপ্রকার দেশীসংগীতের অপেক্ষা এই মার্গ-সংগীত আমার কানে সবচাইতে বেশি মিষ্টি লাগে, আমার মনকে সবচাইতে বেশি আনন্দ দেয়, আমার হৃদয়কে সবচাইতে বেশি স্পর্শ করে। এ সংগীতে ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন দেশীসংগীতের একটি বিশেষ ধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। প্রাকৃতের হিসাবে সংস্কৃতের যে স্থান, দেশীসংগীতের হিসাবে মার্গসংগীতেরও সেই স্থান। এ পরিণতির অন্তরে যুগ-যুগান্তরের সংগীত-সাধকদের সাধনা সঞ্চিত রয়েছে। অনেকের বিশ্বাস রাজার আজ্ঞায় রাজদরবারে এর সৃষ্টি। আমার ধারণা এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। এমন পূর্ণাবয়ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর সংগীত কেউ ফরমায়েশ দিয়ে রাতারাতি গড়িয়ে নিতে পারে না। বিশেষতঃ কোনও রাজারাজড়া ত নয়ই। কল্লিনাথ সংগীতের গান সম্বন্ধে নৃপালকে ত গোপালের দলেই ফেলেছেন।

এ যুগে এই উচ্চ অঙ্গের সংগীতের আদর যে ক্রমে কমে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং এই দুর্গতির কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা দরকার। রাগ-আলাপ শুনে একালের শুধু ছেলেরা নয়, বুড়োরাও যে হাসে—

এর চাক্ষুষ পরিচয় আমরা নিত্যই পাই। কিন্তু সে কার দোষে—শ্রোতার না গায়কের? আমার বিশ্বাস এর জন্য উভয় পক্ষই সমান দোষী।

এমন ধ্রুপদী নিত্য দেখা যায় যিনি কোনও ধ্রুপদের একপদ পর্যন্ত অগ্রসর না হয়েই তালের ডনবৈঠক করতে শুরু করেন। কালোয়াতি ভাষায় এর নাম ভাগবাঁট করা। তখন সুর থাকে পড়ে, আর ওস্তাদজির কণ্ঠ থেকে যা নিঃসৃত হয় তা সংগীতের হ য ব র ল ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁরা ভুলে যান যে ধ্রুপদের প্রধান গুণ হচ্ছে তার repose। গায়ক যদি ধ্রুপদের গাম্ভীর্য নষ্ট করেন, তাহলে শ্রোতারা যদি তাঁদের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে না পারেন—তাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

তারপর খেয়ালীদের কীর্তিকলাপ আরও অদ্ভুত। এরা মুখ না খুলতেই তান বেরতে শুরু করে। আমি অবশ্য তানের বিরোধী নই। সংগীতে যে সরল রেখা ব্যতীত অপর কোনও রেখার ব্যবহার দূষণীয়—এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। ধ্রুপদ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যেই আবদ্ধ,—খেয়াল তার থেকে মুক্তি লাভ করে তার তৃতীয় অধ্যায় অধিকার করে বসেছে। চিত্রকলাতেও দেখা যায়, আদিম চিত্রকরদের সরলরেখাই হচ্ছে একমাত্র সম্বল। পরে উক্ত কলার ক্রমবিকাশের ফলে সে-রেখা বাঁকে চোরে, ঘোরে ফেরে। আমার ধারণা এরূপ হওয়াটা উন্নতিরই লক্ষণ। এমন কি ধ্রুপদীরাও মুখে না হোক, কার্যতঃ এ সত্য মেনে চলেন। মিড় দেওয়ার অর্থই হচ্ছে সুরের কোণ মেরে দেওয়া। যদিচ আমি তানের একান্ত পক্ষপাতী, তবুও একালের খেয়ালীরা তানের যেরূপ অপপ্রয়োগ এবং দুষ্টপ্রয়োগ করে থাকেন, তা আমার কানেও অসহ্য। তান করতপ ইত্যাদিকে সংগীতের অলংকার বলা হয়। অলংকারের উদ্দেশ্য অবশ্য দেহের শোভাবৃদ্ধি করা, ঢেকে ফেলা নয়। খেয়ালীদের প্রযুক্ত অলংকারের প্রাচুর্য এবং অসংগত ও অযথা বিন্যাসের ফলে লোকে সুরের চেহারা প্রায়ই দেখতে পায় না। কতকগুলো টুকরোর সমষ্টিতে সংগীতের রূপ জন্মলাভ করে না, কেননা সে রূপ হচ্ছে অখণ্ড

ও সমগ্র। পূর্বোক্ত শ্রেণীর খেয়ালীরা সংগীতের রূপের সঙ্গে তার রসও নষ্ট করেন। সুতরাং সে-গানে যে লোকে রস পায় না, তাতে আর আশ্চর্য কি? সুরের কুচিমোড়া-ভাঙা ও ডিগবাজি-খাওয়া অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হলেও সংগীত নয়; কেননা সংগীত বাজি নয়, জাদু।

দেহীমাত্রেরই রূপ কেবলমাত্র দেহের রেখার সুষমার উপর নির্ভর করে না—তদুপরি বর্ণও চাই। বর্ণ শুধু রূপকে প্রকাশ করে না—সেই সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত প্রাণেরও পরিচয় দেয়। স্বরই হচ্ছে সংগীতের বর্ণ। কেন জানি নে অধিকাংশ ওস্তাদ তাঁদের কণ্ঠস্বরকে অতিশয় কর্কশ করে তোলেন। বাণী বীণাপাণি প্রকৃতি-মুখরা বটে, কিন্তু তিনি যে কর্কশা—এ সত্য ওস্তাদজিরা কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? এমন খেয়ালীও দুষ্প্রাপ্য নয়, যাঁদের একটি তান বার করতে কণ্ঠের প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। কেউ কেউ বা তান গাঁজার ধোঁয়ার মত নাক দিয়ে ছাড়তে বাধ্য হন। স্বরের উৎপত্তিস্থান কণ্ঠ, মূর্ধা, মণিপদ্ম, নাভিপদ্ম যেখানেই হোক না, তার বহির্গমনের পথ যে নাসিকা—এ কথা কোনো শাস্ত্রেই বলে না।

উচ্চ অঙ্গের সংগীতের উপর এইরূপ অত্যাচার করার প্রধান কারণ, কলাবতেরা ভুলে যান যে সংগীত আর্ট, সায়ান্স নয়—এবং সংগীতের উদ্দেশ্য শ্রোতাকে আনন্দ দেওয়া, নিজের মুখস্থ বিদ্যার দৌড় দেখানো নয়। এই সংগীতের বিদ্যে দেখাতে গিয়ে তাঁদের শুধু বিদ্যেই বেরিয়ে পড়ে। ফলে আনাড়ির দল হাসে, আর সুরেলা লোকেরা চটে।

৫

এই pedantryর দোষে, এক pedantএর দল ছাড়া অপর সকলের কাছে উচ্চ অঙ্গের সংগীত হয় উপেক্ষা নয় অবজ্ঞার বস্তু হয়ে উঠেছে। এ অবশ্য অতিশয় দুঃখের বিষয়, কেননা পূর্বেই বলেছি যে আমার মতে এই শ্রেণীর সংগীতেই ভারতবর্ষের সংগীত তার পূর্ণশ্রী, পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে।

সুতরাং এ সংগীত শিক্ষা করতে গেলে বেশির ভাগ লোকেই কেন আর্টিস্ট না না হয়ে pedant হয়ে ওঠে—তার কারণও নির্ণয় করবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

আর্টের রাজ্যের অপূর্ব কীর্তিগুলিকে অমর করবার ইচ্ছা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের কীর্তিগুলি সব নিজের জোরেই দাঁড়িয়ে থাকে—কেননা ও-সকল আর্টের উপাদান কঠিন জড়পদার্থ। যে আর্টের উপাদান শব্দ, সেই আর্টকে রক্ষা করবার উপায়, হয় তাকে কণ্ঠস্থ নয় লিপিস্থ করা। যতদিন না মানুষে অক্ষরের আবিষ্কার করে, ততদিন কাব্য কিংবা সংগীত কণ্ঠস্থ করে রাখা ব্যতীত তা রক্ষা করবার উপায়ান্তর নেই।

আমাদের দেশে স্বরলিপি ছিল না বলে, আবহমানকাল সংগীত কণ্ঠস্থ করেই রক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং কোন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গীতকে উক্ত উপায়ে রক্ষা করতে হলে, কণ্ঠস্থকারকে তার একসুরও বদল করবার অধিকার দেওয়া যেতে পারে না; যেমন বেদমন্ত্রের এক অক্ষরও বদল করবার অধিকার সেকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় নি। লিপিকারকে ইচ্ছামত শকুন্তলার পরিবর্তন করবার স্বাধীনতা কোনও কাব্যভক্ত লোক দিতে পারেন না। তানসেনের দরবারী-কানাড়া যদি রক্ষা করতে হয়—তাহলে তাঁর অপেক্ষা নিকৃষ্ট গায়ককে তার অঙ্গহানি করবার অধিকারে বঞ্চিত করতে হয়। সংগীতকে এইভাবে কণ্ঠস্থ করে রক্ষা করবার সুফল হয়েছে এই যে, পূর্বাচার্যদের রচিত অনেক গান আজও সশরীরে বর্তমান আছে। যথার্থ আর্টিস্টের হাতে পড়লে সে শরীরে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর পক্ষে এর কুফল হয়েছে এই যে, আমাদের গুণীর দল সব অল্পবিস্তর pedant হয়ে পড়েছেন; প্রাণ দূরে থাক, সংগীতের দেহ পর্যন্তও তাঁদের কাছে উপেক্ষণীয়, তাঁরা শুধু তার কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচাড়া করেন।

সংগীতের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ এই যে, কাব্য যে-খুশি সে-ই মুখস্থ

করতে পারে, কিন্তু সংগীত অধিকারী ব্যতীত অপর কেউ কণ্ঠস্থ করতে পারে না। যার ভগবদ্দত্ত গানের গলা ও সুরের কান নেই, সে হাজার পরিশ্রম করেও ও-বস্তু 'আদায়' করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে composer তো আর্টিস্টই, এবং যে ব্যক্তি আর্টিস্ট হবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় নি, সে executant হতে পারে না।

কিন্তু স্বরলিপির অভাবে এ দেশে executantকে তার সমস্ত মনটাকে নির্ভুল ভাবে কণ্ঠস্থ করবার দিকেই দিতে হয়; ফলে তার ভিতরকার আর্টিস্ট স্বাধীনতার অভাবে পঙ্গু হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে মুখস্থকার প্রবল হয়ে ওঠে। এই কারণেই রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নিয়ে, ওস্তাদে ওস্তাদে এত কোস্তাকুস্তি এত ধ্বস্তাধ্বস্তি। কে কত ভাল মুখস্থ করেছে, কে কত মাছিমারা নকল করতে পারে, তার উপরেই তার কৃতিত্ব নির্ভর করে। যিনি কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করেছেন, তাঁর কাছে ব্যাকরণের কূটতর্ক যেমন অপ্রীতিকর,—যিনি সংগীতরসের রসিক, তাঁর কাছে সংগীতবিদ্যার কচকচিও তেমনি বিরক্তিকর। যারা কবি হয়ে জন্মেছে, তারা বৈয়াকরণ হতে বাধ্য হলে কাব্যের যে সর্বনাশ হয়—যারা আর্টিস্ট হয়ে জন্মেছে, তারা ওস্তাদ হতে বাধ্য হলে সংগীতেরও সেই সর্বনাশ হয়। স্বরলিপি থাকার দরুন ইউরোপের গাইয়ে-বাজিয়েদের এ বিপদে পড়তে হয় নি। মোজার্ট বেটোভেনের রচিত সংগীত যে কি, তা নিয়ে গুণীর দলকে মারামারি করতে হয় না, কারণ যার খুশি তিনিই তা স্বচক্ষে দেখে নিতে পারেন। সেই লিপিবদ্ধ সংগীতকে সুরে অনুবাদ করা এবং সেই সঙ্গে তাকে সজীব করে তোলার ক্ষমতার উপরেই সে-দেশের ওস্তাদদের কৃতিত্ব নির্ভর করে।

৬

কি চিত্রে, কি কাব্যে, কি সংগীতে—আর্টিস্টমাত্রেই নববস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং আর্টের যে শিক্ষাপদ্ধতি আর্টিস্টকে নববস্তুর সৃষ্টির পথে বাধা দেয়, সে শিক্ষা

আর্টের উন্নতির পথ রোধ করে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সংগীতশিক্ষার পুরো ঝোঁকটা পুনরাবৃত্তির উপরেই পড়েছে। সুতরাং মার্গ-সংগীতে এ দেশে নব নব রাগরাগিণীর সৃষ্টি বহুকাল থেকে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা composer হবার অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি। শকুন্তলা সংস্কৃত নাটকের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে বলে সংস্কৃত কবিরা যদি তারই আবৃত্তি ও অনুবৃত্তি করাই তাঁদের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন, তাহলে উত্তররামচরিত রচিত হত না। আর্টিস্টকে কিন্তু একেবারে গতানুগতিকের দাস করা যেতে পারে না, সুতরাং সুরের নূতন মূর্তি গড়বার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের দেশের গুণীর দল তাদের সকল রচনাশক্তি অলংকারের বৈচিত্র্য-সাধনের উপরেই প্রয়োগ করেছে। এর সুফল হয়েছে এই যে, বাঁধা ঠাটের হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করে মার্গসংগীত তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে তার কুফল হয়েছে এই যে, রাগরাগিণী কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালীর হাতে পড়ে অলংকারের অন্তরে অন্তর্হিত হবার সুযোগ পেয়েছে। ধ্রুপদে তানের স্থান নেই, সুতরাং ও-গানে ওস্তাদী দেখাতে হলে তালের গুণ-ভাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অপর পক্ষে খেয়ালের তাল ঠেকায় গিয়ে দাঁড়ানোতে সে গানে ওস্তাদী দেখাতে হলে তানের যোগ-বিয়োগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। ফলে মার্গসংগীতের গুণীপনা এখন তাল ও সুরের আঁক-কষাতে পরিণত হয়েছে। সে-আঁক যে যত জল্‌দি কষতে পারে, সে তত মার্ক পায়। সুরতালের শুভংকরী যে সংগীতের পক্ষে শুভকরী নয়—এ অতি সোজা কথা।

৭

তবে সত্যের খাতিরে এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গায়ক যদি পণ্ডিত না হয়ে যথার্থ আর্টিস্টও হন—এবং গাইয়ে-বাজিয়েদের দলে আর্টিস্টের আজও কোনো অভাব নেই—তাহলেও আমাদের দেশের এ যুগের

বেশির ভাগ ছেলেবুড়ো তাঁর গান শুনে না হাসুন, গম্ভীর হয়ে যাবেন—অর্থাৎ তাতে তাঁরা ক্লেশ বোধ করবেন। এর জন্য দোষী অবশ্য শ্রোতার দল। এরূপ হবার কারণ কি এই নয় যে, যাকে আমরা 'মিউজিক্যাল ফিলিং' বলি তাতে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত? গানবাজনায় আমাদের মনে যে 'ফিলিং' এনে দেয়—তা যে, আমরা যাকে সুখদুঃখ বলি তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এ জ্ঞান সংগীত-প্রাণ লোকমাত্রেরই আছে। যাঁদের অন্তরে 'মিউজিক্যাল ফিলিং' নেই, তাঁদের কাছে অবশ্য এ কথা গ্রাহ্য নয়, এবং কোনোরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে এমন কি যুক্তিতর্ক আছে, যার সাহায্যে অন্ধকে রূপের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে? মিউজিক্যাল ফিলিং এর স্বাতন্ত্র্য তর্কের দ্বারা প্রমাণ না করতে পারলেও তার স্বরূপ আমরা বর্ণনা করতে পারি, এবং আমি যতদূর-সম্ভব সংক্ষেপে এই বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

আমাদের দেশের নব্য-আলঙ্কারিক মতে—

রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।

পূর্বোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতচমৎকারত্বাপর পর্য্যায়োঽনুভব সাক্ষিকো জাতিবিশেষঃ। কারণং চ তদবচ্ছিন্নে ভাবনাবিশেষঃ পুনঃপুনরনুসংধানাত্মা। "পুত্রস্তে জাতঃ," "ধনং তে দাস্যামি" ইতি বাক্যার্থধিজন্যস্যাহ্লাদস্য ন লোকোত্তরত্বম।

—রসগঙ্গাধর

অর্থাৎ, যে শব্দদ্বারা আমাদের মনে লোকত্তরাহ্লাদ জন্মে, তাই কাব্য। লোকোত্তরাহ্লাদ একটি বিশেষ-জাতীয় আহ্লাদ এবং সে-আহ্লাদের একমাত্র সাক্ষী হচ্ছে অনুভূতি। 'তোমার ছেলে হয়েছে' 'তোমাকে টাকা দেব'—এ কথা শুনে লোকের মনে যে আহ্লাদ হয়, সে অবশ্য লোকোত্তরাহ্লাদ নয়। রসগঙ্গাধরের টীকাকার বলেন—'অনুভব সাক্ষিক' এই কথা বলায়,

অস্ত' প্রমাণের নিরাস করা হয়েছে। এবং সে অনুভব কার?—না সহৃদয় লোকের।

কাব্য হতে আমরা যে আনন্দ পাই তা যে একটি 'বিশেষ জাতীয়' আনন্দ এবং তা যে আমাদের লৌকিক আনন্দের পর্যায়ভুক্ত নয়—এ বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। তবে কাব্যের আনন্দ যে 'বাক্যার্থবিভক্ত' নয়, এ কথা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেননা কাব্যে আমরা অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করি নে; সুতরাং কাব্যের "ভাবনা" আমাদের ব্যবহারিক মনের অতিরিক্ত হলেও সম্পূর্ণ বহির্ভূত নয়। কাব্য আমাদের লৌকিক সুখদুঃখের সঙ্গে এতটা জড়িত যে, কাব্যরস যে পৃথক এবং স্বতন্ত্র বস্তু, একথা মানুষে সহজে স্বীকারও করে না, ধরতেও পারে না।

সংগীতের আনন্দ যে শুধু আংশিকভাবে নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকোত্তরাহ্লাদ, সংগীত-রস যে আমাদের হৃদয়-রসের বিকারমাত্র নয়, এ সত্য গ্রাহ্য করবার পক্ষে তেমন কিছু বাধা নেই। সংগীতেও শব্দ আছে, কিন্তু সে শব্দের কোনো লৌকিক অর্থ নেই। সংগীতের ভাষা আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে", কিন্তু মস্তিষ্কের পথ ধরে নয়; অর্থাৎ সংগীত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অধীনও নয়, গ্রাহ্যও নয়। সুতরাং সংগীত-রস যে কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ, তার স্পষ্ট পরিচয় যন্ত্রসংগীতে পাওয়া যায়। যাঁর বীণ কি বেহালা শুনে প্রাণ আকুল না হয়ে ওঠে, তাঁর প্রাণে সংগীত নেই। গায়কের রাগরাগিণীর আলাপও ঐ যন্ত্রসংগীতেরই সামিল; তফাৎ এইটুকু—এ স্থলে যন্ত্র হচ্ছে কণ্ঠ,—তাঁত কিম্বা তার নয়। গীত, আমার বিশ্বাস, যে-পরিমাণে সংগীত হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণে তাতে কথার প্রাধান্য কমে আসে।

মার্গসংগীতের চাইতে দেশীসংগীত যে ঢের বেশি লোকপ্রিয়, তার কারণ এ নয় যে দেশীসংগীত সহজ, ও মার্গসংগীত কঠিন। দেশীসংগীতে কথার প্রাধান্য থাকার দরুন তা এত 'জনহৃদ্রঞ্জক'। যাঁরা সংগীতপ্রাণ নন্ তাঁরাও লৌকিক অর্থে অতি সহৃদয় ব্যক্তি হতে পারেন। এই শ্রেণীরই ব্যক্তিরা দেশী

সংগীতের কথার রসে মুগ্ধ হন। সে কথা স্বরসংযোগে উচ্চারিত হয় বলে সম্ভবতঃ তাঁদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে একটু বেশি করে ঘা দেয়, আর সেই কারণ তাঁদের হৃদয়ের কপাট একটু বেশি ফাঁক হয়ে যায়। এ-সত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলার কীর্তন। কিন্তু তাঁরা যে আনন্দ অনুভব করেন, সে পূর্ণমাত্রায় সংগীতগত আনন্দ নয়। জনসাধারণের মতে গান কাব্যেরই একটি অঙ্গ। কারো মতে সেটি উঁচুদরের, কারও মতে নিচুদরের, এই যা তফাত।

শাস্ত্রমতে সংগীতকেও কাব্যের মত বীর, করুণ, শান্ত প্রভৃতি নানা রসের আধার বলে কল্পনা ও বর্ণনা করা হয়েছে। আর বীণে ভৈরবীর আলাপ শুনলে যে চোখে জল আসে, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। অতএব ভৈরবীকে করুণরসাত্মক বলায় আমার আপত্তি নেই—যদি আমরা মনে রাখি যে ভৈরবী শুনলে আমাদের মনে পুত্রশোক উপস্থিত হয় না, যা হয় তা বিশুদ্ধ আনন্দ। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের শোকদুঃখের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। মানুষের ভাষা তার ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে এবং সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল। সুতরাং যে-সকল 'ভাবনা' ব্যাবহারিক মনের বস্তু নয়, তার নামকরণ করতে হলে, আমরা তাদের গায়ে আমাদের জানা কথাগুলির ছাপ মেরে দিই। এ নামকরণ অবশ্য কতকটা সাদৃশ্যমূলক। তারপর সংগীতরসে করুণ বীর প্রভৃতি মনোধর্মের আরোপ যে উপমামাত্র, এ কথা আমরা বিলকুল ভুলে যাই। মানুষের ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ গেরস্থালির ভাষা—সে ভাষায় সংগীত-রসের কোনও নাম নেই। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে, কাব্যরসের একমাত্র নাম হচ্ছে 'কে'পি'—অর্থাৎ 'কি জানি কি।' কাব্যরসসম্বন্ধে যাই হোক, সংগীত-রসের 'কে'পি' ছাড়া আর নাম নেই এবং হতে পারে না। ধর্মের ন্যায় আর্টেরও মর্ম, 'নেতি নেতি' ছাড়া অপর কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পেশাদারী শিক্ষার প্রসাদে আমরা সাংসারিক লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে কাব্য বলো, সংগীত বলো, সবই যাচাই করে নিতে চাই।

আর্টিস্টিক নাস্তিকতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সুতরাং মার্গসংগীত লোকপ্রিয় নয় বলে দুঃখ করার কোন ফল নেই। যারা সংগীত-রসের রসিক নয়, তাদের কাছে আসলে কোনো সংগীতই প্রিয় নয়। এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, অধিকাংশ লোক সংগীতরসের রসিক নন্‌ বলেই মার্গসংগীত লোকপ্রিয় নয়।

যাঁরা বলেন মার্গসংগীত কঠিন বলে তার আদর নেই, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। যদি কঠিন বলার অভিপ্রায় এই হয় যে, না শিখে কেউ তা হাতে গলায় বার করতে পারেন না এবং সংগীত-বিষয়ে নৈসর্গিক সংস্কারের অভাবে হাজার মেহনত করেও কেউ তা যথার্থ আয়ত্ত করতে পারেন না, তাহলে আমি বলব যে দেশীসংগীত সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। কীর্তন গাওয়া খেয়াল গাওয়ার চাইতে কিছু কম কঠিন নয় এবং ধ্রুপদ-গাওয়ার চাইতে বেশি শক্ত। উভয় জাতীয় সংগীতেরই টেক্‌নিক্ আছে, এবং বিনা সাধনায় সে টেক্‌নিক্ স্ববশে আনা যায় না।

আসল কথা, পৃথিবীতে এমন কোনও বিদ্যা নেই যাকে সহজ কিংবা কঠিন বলা যেতে পারে, কারণ একজনের কাছে যা কঠিন, আর একজনের কাছে তা সহজ। দার্শনিক গ্রন্থমাত্রেই কাব্যগ্রন্থের চাইতে কঠিন নয়। হার্বার্ট্‌ স্পেন্সারএর First Principlesএর অপেক্ষা মেরেডিথএর Egoist ঢের বেশি শক্ত, এবং ব্রাউনিংএর কবিতার তুলনায় মিলএর দর্শন জল। আর যে জিনিস বোঝা যত কঠিন তা যে তত শ্রেষ্ঠ, এ কথাও সত্য নয়,—নচেৎ স্বীকার করতে হবে যে বেদান্তের 'ভামতী টীকা' শংকর-ভাষ্যের অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠ। প্রকাশ করবার অক্ষমতার দরুনও অনেক সময়ে বিষয় কঠিন হয়ে ওঠে। কাব্যের সঙ্গে দর্শনের কিন্তু কোনই তুলনা হতে পারে না, কেননা এ দুই-ই হচ্ছে মনোজগতের বিভিন্ন রাজ্যের বস্তু। দর্শন বিজ্ঞান এক পদার্থ, আর আর্ট হচ্ছে অন্য চিজ। সুতরাং কোন কোন কাব্যরসের রসিকের নিকট দর্শন যেমন অপ্রিয়, কোন কোন দর্শন-রসের রসিকের নিকট কাব্য

তেমনি অপ্রিয়। লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, রুচি বিভিন্ন। ভগবান সব মানুষকে এক ছাঁচে গড়েন নি, তা বলে কি করা যাবে? অবশ্য এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা 'খোদার উপর খোদকারি' করতে চান—তাঁদের সঙ্গে তর্ক করার মজুরি পোষায় না। সোজা কথা এই যে, অনধিকারীর নিকট সকল বস্তুই কঠিন।

যা বিনা আয়াসে আদায় করা যায়, যদি তারই নাম সহজ হয়, তাহলে—আমি একবার নয়, একশবার বলব—সংগীতশিক্ষা সহজ নয়। কেননা অপর সকল আর্টের অপেক্ষা সংগীতে টেকনিকের প্রাধান্য ঢের বেশি। যে উপাদান নিয়ে আর্টিস্টকে কারবার করতে হয়, সেই উপাদানের সকল জড়তা, সকল অবাধ্যতা অতিক্রম করবার কৌশলেরই নাম টেক্‌নিক্‌। যার প্রাণে সুর আছে, সেই সুরকে প্রকাশ করতে হলে তার কণ্ঠ ও যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বাধ্য করতে হয়। যেহেতু বাহ্য জগতের উপাদানগুলি সহজে বাগ মানে না, সুতরাং সেগুলিকে স্ববশে আনতে হলে যত্ন চাই, পরিশ্রম চাই, অভ্যাস চাই,—এক কথায় সাধনা চাই। সুতরাং মানুষে মিউজিক্যাল ফিলিং নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও, চর্চার অভাবে বা দোষে তা নষ্ট করতে পারে। বর্তমানে বেশির ভাগ লোক সংগীতচর্চা করেন না, সুতরাং অনেকের অন্তর্নিহিত সংগীত-বীজ চর্চার অভাববশতঃ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে মারা যায়। এই যত্ন পরিশ্রম কিন্তু আমাদের পক্ষে কষ্টকর জিনিস নয়—আনন্দের জিনিস। বাইরের বাধাকে অতিক্রম করা, তার উপর নিজের প্রভুত্ব-স্থাপন করবার চেষ্টাতেই ত আমরা নিজের শক্তির পরিচয় পাই এবং সেই সঙ্গে সুখ পাই। বাধা যত বেশি প্রবল, তাকে অতিক্রম করবার সুখও তত বেশি। সাধনার মধ্যে নিত্য নূতন আনন্দ পাওয়া যায়; সে হচ্ছে নিত্যনূতন শক্তি উদ্বোধনের ও সঞ্চয়ের আনন্দ। সুতরাং যথার্থ সাধনপদ্ধতি কঠিনও নয়, কষ্টকরও নয়। যিনি যে বিষয়ের সাধনাকে কষ্টকর মনে করেন, তিনি সে বিষয়ে অনধিকারী; সুতরাং তাঁর পক্ষে সে সাধনা যে-পরিমাণে কষ্টকর, সে-পরিমাণে ত্যাজ্য।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এ কথা আর্ট সম্বন্ধেও খাটে। দুর্বলের পক্ষে সাধনামাত্রই শুধু কঠিন নয়—ভয়াবহ; এবং আলস্য দুর্বলতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেয়? আমরা যে কি সাহিত্যে কি সংগীতে অনেক জিনিস হেসে উড়িয়ে দিই, তার কারণ সে সব আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি নে।

আর একটি কথা, আর্টকে সামান্য হিসেবে যদি শেখানো হয়, তাহলে সাধনপদ্ধতির দোষে সে শিক্ষা যে নিরানন্দ হয়ে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ফলে সাধনমার্গ কঠিন না হোক, এ-ক্ষেত্রে শুষ্ক হয়ে উঠেছে। যাঁরা ওষুধ-গেলা-গোছ করে গান শেখেন, তাঁদের গান শুনতে লোকের ওষুধ-গেলায় ভোগই ভুগতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশে সংগীতের চর্চা যে করে যাচ্ছে, তার জন্য গুরুশিষ্য উভয়েই দোষী। কোন্ ক্ষেত্রে কে বেশি দোষী তা, কে-গুরু ও কে-শিষ্য তারই উপর নির্ভর করে। গুরুশিষ্য উভয়েই যদি আর্টিস্ট হন, তাহলে 'গজদন্ত কনকে জড়িত' হয়, নচেৎ সংগীতের শুধু গজদন্ত বেরিয়ে পড়ে।

শ্রোতাদের আলস্য ও গায়ক-বাদকদের ব্যায়াম, এই দুয়ের প্রসাদে মার্গ-সংগীত ঘুমিয়ে না থাক—ঝিমিয়ে পড়েছে। বিলাতী-সংগীতের কাঠির স্পর্শে সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে কি-না তা আমি বলতে পারি নে, কেননা সে কাঠি সোনার কি রুপোর তা আমি জানি নে। এইমাত্র আমি জানি যে, দেশী মার্গ সকল প্রকার গানবাজনা আমার কানে স্বদেশী বলেই ঠেকে এবং সকল প্রকার ইউরোপীয় সংগীত বিদেশী বলেই ঠেকে। এ প্রভেদের মূল আবিষ্কার করতে না পারলে, বিলাতী সংগীতের ধাক্কায় স্বদেশী সংগীত জেগে উঠবে, কি মারা যাবে—বলা অসম্ভব। আশা করি, যাঁর উভয় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে, এমন কোনও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, যে-উপায়ে আমাদের নব-সাহিত্য গড়া হচ্ছে, সে-উপায়ে নব-সংগীত গড়বার জো নেই; কেননা সংগীত জিনিসটে তর্জমা করা চলে না, ওর ব্যাকরণ থাকলেও অভিধান নেই।

আমি পূর্বেই বলেছি, মার্গসংগীত ঝিমচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ওস্তাদীর আফিং ছাড়াবার উদ্দেশ্যে কেউ যে তাকে বিলাতী সংগীতের মদ ধরাতে প্রস্তুত, এর প্রমাণ তো অদ্যাবধি পাই নি। বিলাতী সংগীত যে উত্তেজক পদার্থ, সে-সংগীত যিনি কান দিয়ে পান করেছেন, তিনিই তা জানেন। সংগীত-বিষয়ে আমি গুণীও নই জ্ঞানীও নই, সুতরাং এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংগীতের মামলার ইস্যু ধার্য করে দেওয়া। বিচার আর-পাঁচজনে করুন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সুরের কথা

দেশী-বিলাতী সংগীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, এই সুযোগে আমি গলাযোগ করতে চাই।

এ বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারেন এক তিনি, যিনি সংগীতবিদ্যার পারদর্শী, আর এক তিনি, যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী; অর্থাৎ যিনি সংগীতসম্বন্ধে হয় সর্বজ্ঞ, নয় সর্বাজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এ বিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।

আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সারসংগ্রহ করেছি, সংক্ষেপে তাই বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, সংগীতের সুর ও সার পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কানের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সুরসার,—কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসাবে।

সব বিষয়েরই শেষ কথা তার প্রথম কথার উপরেই নির্ভর করে। যে বস্তুর আমরা আদি জানি নে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হলে, তার আলোচনা ক খ থেকে শুরু করাই সনাতন পদ্ধতি, এবং এ ক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করব।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে, যারা দিব্যি বাংলা বলতে পারে অথচ ক খ জানে না—আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষই তো ঐ দলের। অপরপক্ষে এমন প্রাণীরও অভাব নেই, যারা ক খ জানে অথচ বাংলা ভাল বলতে পারে না—যথা আমাদের ভদ্র শিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য নয় যে, এমন গুণী ঢের আছে, যারা দিব্যি গাইতে বাজাতে পারে, অথচ সংগীতশাস্ত্রের ক খ জানে না; অপর-পক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাকতে পারে, যারা সংগীতের শুধু ক খ নয়, অনুস্বর-বিসর্গ পর্যন্ত জানে—কিন্তু গানবাজনা জানে না।

তবে যারা গানবাজনা জানে, তারা গায় ও বাজায়; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধ্বনি না করতে পারি, কলরব করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সুতরাং এই তর্কে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে না। অতএব আমাকে ক খ থেকেই শুরু করতে হবে, অ আ থেকে নয়। কেননা আমি যা লিখতে বসেছি, সে হচ্ছে সংগীতের ব্যঞ্জনলিপি—স্বরলিপি নয়। কারণ, আমার উদ্দেশ্য সংগীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার স্বর সাব্যস্ত করা নয়। আমি সংগীতের সারদর্শী—সুরস্পর্শী নই।

২

হিন্দুসংগীতের ক খ জিনিসটে কি?—বলছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা, আমাদের সংগীতেরও মূল তাই—অর্থাৎ শ্রুতি।

শুনতে পাই এই শ্রুতি নিয়ে সংগীতাচার্যের দল বহুকাল ধরে বহু বিচার করে আসছেন, কিন্তু আজতক এমন কোনও মীমাংসা করতে পারেন নি, যাকে 'উত্তর' বলা যেতে পারে—অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।

কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে-কারণ আমি ও-বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি, যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হতে পারে।

আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই স্বর, যা কানে শোনা যায় না। যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য, যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্য দিব্যকর্ণ চাই। বলা বাহুল্য তোমার আমার মত সহজ মানুষদের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যকর্ণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কানও আছে। ওতেই ত হয়েছে মুশকিল। চোখ ও কান সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি—এ দুটি বিশেষণ, কানে অনেকটা এক শোনালেও, মানেতে ঠিক উল্টো।

সংগীতে যে সাতটি সাদা আর পাঁচটি কালো স্বর আছে, এ-সত্য পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন। এই পাঁচটি কালো স্বরের মধ্যে যে, চারটি কোমল আর একটি তীব্র—তা আমরা সকলেই জানি এবং কেউ কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশোনা জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এদেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরও কালো এবং এমন কালো স্বর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সে-সব হচ্ছে অতিকোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামেই প্রমাণ যে সে-সব অতীন্দ্রিয় স্বর, এবং তা শোনবার জন্যে দিব্য কর্ণ চাই—যা তোমার আমার তো নেইই, শাস্ত্রীমহাশয়দেরও আছে কি-না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস তাঁদেরও নেই। শ্রুতি সেকালে থাকলেও একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্রুতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য তো জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সংগীতসম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া অর্থাৎ পরের কানে মিষ্টি শোনা যাঁদের অভ্যাস, শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি শ্রুতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভাল। অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও-দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়লে, আমাদের কানকে একাদশী করতে হবে।

আর ধরুন যদি ঐ দ্বাদশ সুরের ফাঁকে ফাঁকে সত্য সত্যই শ্রুতি থাকে, তাহলে সে সব স্বর হচ্ছে অনুস্বর। সা এবং নি'র অন্তর্ভূত দশটি স্বরের গায়ে যদি কোনও অসাধারণ পণ্ডিত দশটি অনুস্বর জুড়ে দিতে পারেন, তাহলে সংগীত এমনি সংস্কৃত হয়ে উঠবে যে, আমাদের মত প্রাকৃতজনেরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারবে না।

৩

এ সব তো গেল সংগীতের বর্ণপরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও

যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়। অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনও পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি—প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি টানা তারের গায়ে ঘা মারলে প্রকৃতি অমনি সাত সুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সারগম আলাপ করেন, মানুষে শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিংবা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনও সুর একটু চড়ে, কোনও সুর একটু ঝুলে যায়। তা ত হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়-তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরোয়, তা যে একঘেয়ে হবে—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এই সব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ, এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সংগীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ, এ সত্য তো লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে,—শুধু শব্দ নয়, গোলমাল আছে—এ কথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিস্টরা বলেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যার কান নেই, তার কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা—এ কথা কোন দর্শনেই বলে না। আর্টিস্টদের মতে তৌর্যত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি—গীতবাদ্য—নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের উপাদান, এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম। আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতেকলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সুরের উৎপত্তি, সুতরাং জড় প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে—সৃষ্টির চরম আনন্দে, আর আকাশ-বাতাস কাঁপে বেদনায়—সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিস্টদের মতে, সুর শব্দের অনুবাদ নয়—প্রতিবাদ।

যেখানে আর্ট ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপোশ মীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে সুরের, কিংবা সুর হতে শব্দের উৎপত্তি—সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায়, সুর আগে না রাগ আগে? অবশ্য রাগের বাইরে সারগমের কোনও অস্তিত্ব নেই এবং সারগমের বাইরে রাগের কোনও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সুর পূর্বরাগী কি অনুরাগী—এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা বলতে পারেন বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে—অর্থাৎ কেউ পারেন না।

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর কোনও খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে, সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বাতলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা ও-কথা শোনবামাত্র আর এক দলের বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা, জবাব দেবেন যে, সংগীত আয়ুর্বেদের নয়—বায়ুর্বেদের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্তা তুমি ভোক্তা—এ জ্ঞান যাঁর নেই, তিনি

আর্টিস্ট নন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন করে 'তুমি কর্তা আমি ভোক্তা' এ কথা কোনও আর্টিস্ট কখনও বলতে পারবেন না, এবং ও-কথা মুখে আনবার কোনো দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ—আমরা পৃথিবীশুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সংগীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজ মানুষে চায় তার স্থিতি, ভিত্তি নয়।

৪

অতঃপর দেশী-বিলাতী সংগীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যাক।

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক, তা অবশ্য ক-খ-গত নয়। যে বারো সুর এ দেশের সংগীতের মূলধন, সেই বারো সুর যে সে-দেশের সংগীতেরও মূলধন, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনও ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমি পূর্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে আমরা সংগীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এ নিয়ে আর বেশিকিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশীর সঙ্গে বিলাতী সংগীতের আসল প্রভেদটা ক খ নিয়ে নয় 'কর' 'খল' নিয়ে। BLA=ব্লে, CLA=ক্লের সঙ্গে 'কর' 'খল'র কানের দিক থেকেই হোক আর মানের দিক থেকেই হোক, একটা যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে—এ হচ্ছে একটি 'প্রকাণ্ড সত্য'। এ প্রভেদ উপাদানের নয়—গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলাতী ব্যাকরণ অনুসারে সুরসংযোগ করি, তাহলে

তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, এবং তাতে অবশ্য রাগের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজী ব্যাকরণ অনুসারে ইংরেজী ভাষা লিখলে সে লেখা ইংরেজীই হয় এবং তাতে বাংলা-সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—যদিচ এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজী এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে এবং সেই সঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে তা বাবু-ইংলিশ্ হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখলে তা সাধুভাষা হয়, তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সংগীতেও আমরা রাগ-মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সংগীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাই নে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৫

দেশী বিলাতী সংগীতের মধ্যে আর একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলাতী সংগীতে হার্মনি আছে—আমাদের নেই।

এই হার্মনি জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ে দ্বিতীয় ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনও প্রথম ভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয় ভাগের চর্চা করা উচিত কি-না—সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয় ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথম ভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না-ভুলুন, তাঁরা যে প্রথম ভাগকে আর আমল দেবেন না—সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তি-যুক্ত মনে করি নে, এবং অপর কেউ করতে গেলে অমনি বলে উঠি—সাহিত্যের সর্বনাশ হল, ভাষাটা একদম অসাধু এবং অশুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সংগীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরেজ বলছিলেন,

যে-সংগীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে, সেখানে হারমনি কি করে থাকতে পারে? আমি বলি ওত ঠিকই কথা, বিশেষতঃ স্বামী যখন মূর্তিমান রাগ, আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক-একটি মূর্তিমতী রাগিণী। অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সংগীতের কৌলীন্য। আমাদের রাগসকল যদি কুলীন না হত, তাহলেও আমরা হারমনির চর্চা করতে পারতুম না—কেননা ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মতো আমাদের সংগীতেও জাতিভেদ আছে, এবং তার কেউ আর কারও সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতে ভয় পাই, কেননা জাতির ধর্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে-মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে হারমনি।

বীরবল

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ